ধর্ম

হিন্দু এবং জৈনধর্মে নিরামিষভোজনকে একটি নৈতিক আচরণ হিসেবে গণ্য করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মে সাধারণভাবে মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ নয়, তবে মহায়ানা বৌদ্ধরা নিরামিষ ভোজনকে জীব বা প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি বর্ধনের নিমিত্তে উপকারী বলে মনে করে থাকেন। অন্যান্য আধুনিক ধর্ম-সম্প্রদায়, যারা নিরামিষ ভিত্তিক খাদ্য প্রণালীর পক্ষে সমর্থন প্রদান করেন তারা হলো- 'Seventh Day Adventists', The Rastafari Movement' এবং The Hare Krishnas'।

হিন্দু ধর্ম: হিন্দু মতবাদের অধিকাংশ অনুসারীগণই নিরামিষভোজনকে একটি আদর্শ হিসেবে ধরে রেখেছে। এক্ষেত্রে ৩টি কারণ বিদ্যমান রয়েছে, যথা-

- জীবের প্রতি অহিংসা মতবাদের প্রয়োগ,
- দেবতা বা ঈশ্বরকে 'বিশুদ্ধ' (নিরামিষ) খাবার ভোগ হিসেবে প্রদান করা এবং প্রসাদ হিসাবে তা ফিরে পাওয়া, এবং
- অনিরামিষ জাতীয় খাবার হৃদয় ও আত্মার উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর' এই দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করা।

হিন্দু নিরামিষ ভোজীরা সাধারণতঃ ডিম এবং মাছ-মাংস খাওয়া বর্জন করে, কিন্তু দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য গ্রহণ করে; অতএব, তারা ল্যাক্টো-ভেজিটারিয়ান।

জৈন ধর্ম: জৈনধর্মের অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন যে, জীবিত এবং নির্জীব সকল বস্তুরই বিভিন্ন পরিমাণে 'জীবন' (Life) রয়েছে এবং ইহাদের প্রতি ক্ষতি হ্রাস বা নিবারণের জন্য তারা সর্বান্তকরণে চেষ্টা করে থাকেন। অধিকাংশ জৈন ধর্মবাদীরা ল্যাক্টো-ভেজিটেরিয়ান, কিন্তু অধিক ধর্মনিষ্ঠ জৈনরা মূল জাতীয় শাক্‌সজি খায়না, কারণ এতে

উদ্ভিদটির মৃত্যু হতে পারে। পরিবর্তে তারা সীম এবং ফলজ খাদ্যগ্রহণে মনোনিবেশ করেন, যার চাষাবাদে উদ্ভিদের মৃত্যু হয় না। মৃত জন্তু হতে সংগৃহীত সকল দ্রব্যও খাদ্যদ্রব্য তারা পরিহার করেন। আধ্যাত্মিকভাবে উচ্চস্তর প্রাপ্তির জন্য এ সমস্ত কার্য সাধনকে তারা অপরিহার্য বলে মনে করে থাকেন। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ ব্যাক্তি কেবলমাত্র ফলফলাদি-ই খেয়ে থাকেন। মধুপান করা তাদের জন্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ; কারণ ইহা মৌমাছিদের প্রতি নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। কিছু সংখ্যক জৈনরা 'মূল' এবং পেঁয়াজ জাতীয় খাদ্য খায়না, কারণ এদেরকে মাটি থেকে উঠিয়ে আনতে গেলে অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী মারা যেতে পারে।

বৌদ্ধ ধর্ম: বৌদ্ধধর্মে একটি প্রথা আছে, যদি বৌদ্ধ সন্যাসীরা তাদেরকে খাওয়ানোর নিমিত্তে কোন জীবিত পশুকে হত্যা করতে "দেখে, শুনে অথবা জানে" তবে অবশ্যই তাদেরকে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে, নতুবা তাদের পাপ হবে। তবে ভিক্ষা হিসেবে প্রাপ্ত মাংস কিংবা বাণিজ্যিকভাবে ক্রয়কৃত মাংস এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত নহে। গৌতম বুদ্ধ (খ্রিঃপূঃ 563 - খ্রিঃপূঃ 483) মাংস ভক্ষনকে নিরুৎসাহিত করে কোন মন্তব্য করেননি; (ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্র ছাড়া, যেমন- মানুষ, হাতি, ঘোড়া, কুকুর, সাপ, সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক এবং হায়নার মাংস)। তবে তিনি স্পষ্টতই নিরামিষভোজনকে তাঁর সন্যাসী আচরণ বিধিতে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিতে অমত পোষন করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধদের একটি দল মহায়ানা (মহায়ানা ও বেরাভাদা-দুটি বৌদ্ধীয় দল) বৌদ্ধদের মতে, *সংস্কৃত ভাষায় এমন কিছু উদ্ধৃতি রয়েছে যেখানে গৌতম বুদ্ধ তাঁর অনুসারীগণকে মাংস খাওয়াকে পরিত্যাগ করতে আদেশ করেছেন।* অধিকাংশ চায়নিজ বৌদ্ধরা মাংস ভক্ষন করেন না।

শিখ ধর্ম: শিখ ধর্মীয় মতবাদ নিরামিষভোজন অথবা মাংসভোজন কোনটার পক্ষেই বিশেষ কোন জোর আরোপ করেনা। বরং খাদ্য নির্বাচনের ব্যাপারটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিয়েছে। যাই

হোক, দশম গুরু (22/12/1666 - 7/10/1708) গুরু গোবিন্দ সিং (1699 সালে প্রতিষ্ঠিত) অমৃতধারী শিখদেরকে ইসলামী পদ্ধতিতে জবাইকৃত পশুর মাংস খেতে নিষেধ করেছিলেন। তবে, এর পিছনে রাজনৈতিক কারণ ছিলো এবং তা হলো তৎকালীন নও-মুসলিম নেতৃত্ব হতে নিজেদেরকে পৃথক করা, কারণ মুসলিম জনগোষ্ঠী তখন ব্যাপকভাবে হালাল মাংস খাওয়ায় লেগেছিল।

'অমৃতধারী' শিখ (যেমন অখন্ড কীর্তনী, দমদমী টাক্‌শাল, নামধারী, রারিহানওয়ালে) রা তীব্রভাবে মাছমাংস ও ডিম খাওয়ার বিরুদ্ধে; তবে তারা দুধ, মাখন এবং পনির খায় ও অন্যদেরকে খেতে উৎসাহিত করে। শিখ জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত এরকম বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষণ করে- শিখ গুরুগণ খাবারের সামান্যতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে খাদ্য সম্পর্কিত তাদের ধর্মীয় অবস্থান পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। গুরু নানক বলেছিলেন, অতিরিক্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ লোভের পরিচায়ক। তাদের ধর্মগ্রন্থে উদ্ধৃত আছে যে, পশু জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া বোকামী ছাড়া কিছু নয়, যদিও সমস্ত জীবজগৎ পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত; একমাত্র মানব জীবনই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে শিখ লঙ্গঁর খানায় (যেখানে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়), তা মূলতঃ 'ল্যাক্টোওভেজিটারিয়ান' খাদ্য।

ইহুদী ধর্ম: ইহুদী ধর্মাবলম্বী মধ্যযুগীয় অনেক পন্ডিত (যেমন জোসেফ আলবো) নিরামিষ ভোজনকে একটি নৈতিক আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা কেবলমাত্র জীবের মঙ্গলার্থেই নয়, বরং এজন্য যে, এহেন খাদ্যের জন্য 'প্রাণীবধ" তার সাথে জড়িত ব্যক্তির কুটিল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে জাগিয়ে তুলতে পারে। অতএব, এক্ষেত্রে জীবের মঙ্গলের চেয়ে তাদের উদ্বেগের বেশী কারণ ছিলো মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভাবনার শংকা। বস্তুতঃ র‍্যাবি (Rabbi- ইহুদী পুরোহিত) 1380 খ্রিঃ -1444 খ্রিঃ) জোসেফ অ্যালবো (নিরামিষ

ভোজনের বিপক্ষাবলম্বী) মত প্রকাশ করেন যে, পশু বা জীবের হিতার্থে মাংস খাওয়া পরিত্যাগ করা কেবল ভ্রান্ত-ই নয়, অপ্রীতিকরও বটে।

নিরামিষ ভোজনের পক্ষাবলম্বী একজন আধুনিক ইহুদী পন্ডিত ছিলেন র‍্যাবি আব্রাহাম-আইজ্যাক কুক (1865 খ্রিঃ - 1935 খ্রিঃ)। র‍্যাবি কুক তাঁর রচনাবলীতে নিরামিষ ভোজনকে একটি আদর্শ হিসাবে পরিগণিত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, *আদি পিতা আদম পশুর মাংস খেতেন না।*

কিছু সংখ্যক কাব্বালিষ্ট (Kabbalist- ইহুদীদের অধ্যাত্মবাদী একটি মতাদর্শের অনুসারীগণ) বিশ্বাস করেন যে, কোনভাবেই মাছ মাংস খাওয়া মানুষের জন্য অনুমোদিত হতে পারে না, কারণ তা তাদের আত্মাকে কলুষিত করতে পারে।

প্রাচীন ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মের সাথে বন্ধনযুক্ত একটি প্রাচীন ইহুদী ধর্ম সম্প্রদায় (Essene) খ্রিঃ পূর্ব ২য় শতব্দী হতে বিন্দু খ্রিঃ পূর্ব ১ম শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু ও জৈন ধর্মানুসারীদের মতই কড়া নিরামিষভোজী ছিলেন।

প্রচীন গ্রীক ও রোমান দর্শন: নিরামিষভোজন সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক দর্শনের রয়েছে একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য। ***পিথাগোরাস*** (খ্রিঃপূর্ব 570- খ্রিঃ পূর্ব 495) নিরামিষভোজী ছিলেন এবং তাঁর অনুসারীগণও। ***সক্রেটিস*** (খ্রিঃ পূর্ব 469 - খ্রিঃপূর্ব 399) নিরামিষভোজী ছিলেন এবং তাঁর রচনায় একটি আদর্শ প্রজাতন্ত্রে সাধারণ জনগণ অথবা কমপক্ষে দার্শনিক নেতারা খাদ্য হিসাবে কি গ্রহণ করবেন তার উত্তরে তিনি কেবলমাত্র নিরামিষ ভিত্তিক খাদ্যাভ্যাসের কথাই উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মাংস ভক্ষন ন্যায্য বলে বিবেচিত হলে সমাজে বেশী সংখ্যক চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে।

রোমান লেখক ও কবি Publius Ovidius Nasu (খ্রিঃ পূর্ব 43 - 18 খ্রিঃ) ওভিদ (Ovid) তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম মেটামরফসিস' (Metamorphoses) এ নিরামিষ ভোজনকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস বা নীতিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, মানুষ এবং জীবের প্রাণ এমনই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, ***একটা প্রাণীকে হত্যা করা কার্যতঃ একজন মানুষকে হত্যা করার সমান।*** তাঁর ভাষায় *"সব কিছুই পরিবর্তিত হয়; কিন্তু কোন কিছুই নিঃশেষ হয়ে যায় না; আত্মা এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করে এখন এখানে আবার পরে ওখানে এবং তার জন্য নির্ধারিত দৈহিক গঠনকে গ্রহণ করে, পশু হতে মানবদেহে ভ্রমন করে, আবার আমাদের নিজস্ব গঠন হতে পশুতে এবং কখনোই নিঃশেষ হয়না।* অতএব, এই আশংকা থেকে যায় যে, ক্ষুধা এবং লোভ ভালোবাসা ও কর্তব্যের বন্ধন ধ্বংস করে দেয়, আমার এই বাণী মনোযোগ সহকারে শোন। ***বিরত থাকো! কখনোই বধ করার মাধ্যমে আত্মাকে কলুষিত করোনা"।***

খ্রিষ্ট ধর্ম: বর্তমান খ্রিষ্টীয় সংস্কৃতিতে নিরামিষ ভোজন কোন প্রচলিত বা সাধারণ খাদ্যাভ্যাস নয়; তবে কিছু সংখ্যক সন্যাসী এবং গোঁড়া খ্রিষ্টবাদী এই মত অনুসরণ করে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই মতবাদের শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক সমর্থন রয়েছে।

ইসলাম ধর্ম: মুসলমানদের চিকিৎসাগত কারণে অথবা ব্যক্তিগত রুচিবোধের কারণে নিরামিষভোজী হওয়ার নির্বাচনের স্বাধীনতা রয়েছে। তবে যাই হোক, অচিকিৎসাগত কারণে নিরামিষভোজী হওয়া, কোন কোন ক্ষেত্রে বিতর্কিত বলে প্রতীয়মান হয়। অনেক প্রভাবশালী মুসলিম মণিষীরা নিরামিষভোজী ছিলেন যথাগু অধ্যাত্মবাদী এবং মহীয়সী নারী কবি রাবেয়া বস্‌রী (মৃত্যু- ৮০১ খ্রিঃ), মুহাম্মদ আল গাজালী, হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী, হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া, শাহ আবদুল করিম, বুললে শাহ্ এবং শ্রীলঙ্কান সূফী সাধক বাওয়া মুহাইয়াদ্দিন (মৃত্যু 8/12/1986) যিনি উত্তর আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার (Bawa Muhaiyaddin Fellowship) এর প্রতিষ্ঠাতা।